বাংলা রাজনৈতিক ছড়া

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পি.এইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

তুষার নস্কর

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২১

কৃতজ্ঞতা

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পশ্চাতে থাকে তার পূর্ব প্রস্তুতি। এই গবেষণাপত্রটির প্রস্তুতি পর্বে যাঁরা আমায় সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী। কয়েকটি অক্ষরের সমাবেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই ঋণ পরিশোধ সম্ভব নয়।

যাঁর নিপুণ তত্ত্বাবধান, সদা তৎপরতা, আন্তরিক সহায়তা এবং অকুণ্ঠ উৎসাহদান ব্যতীত আমি এই গবেষণাপত্রটি নির্মাণে সমর্থ হতাম না, এই গবেষণাপত্রটির পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে মুখ্য অবদান যাঁর, তিনি হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনন্যা বড়ুয়া। সর্বদা তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত আমার এই গবেষণা বর্তমান রূপ লাভ করত না। সে জন্য তাঁকে আমার শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণতী নিবেদন করি। এছাড়া আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি প্রয়াত অধ্যাপক সৌমেন সেন মহাশয়কে, তিনি আমাকে এই কার্যে উৎসাহিত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সকল শিক্ষকবৃন্দের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে একজন গবেষক হওয়ার উপযুক্ত করে তুলেছেন।

এই গবেষণাপত্রটির রচনায় আমি যে সকল গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি, সেই সকল গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থাগারগুলি হল- বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার।

সবশেষে আমি ঋণ স্বীকার করি আমার বাবা, মা ও পরিবারবর্গের কাছে যাদের স্নেহ ও ভালোবাসায় আমি এ কাজ করতে সমর্থ হয়েছি। বিশেষত আমার স্ত্রী দেবিকা মণ্ডলের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ, যার উৎসাহ ও সহায়তা ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হত না। কিন্তু আমার দুঃখ আমার পরম আরাধ্য পিতৃদেব তাঁর জীবিত অবস্থায় দেখে যেতে পারলেন না তাঁর দীর্ঘ লালিত স্বপ্নকে আমি বাস্তবায়িত করেছি। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার শতকোটি প্রণাম।

তুষার নস্কর

(বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়- রাজনৈতিক ছড়া উদ্ভবের প্রেক্ষিত।

১.১. বাংলা ছড়ায় ইতিহাস: পলাশি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

১.২. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়- রাজনীতি: প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির প্রেক্ষিতে ছড়ার ভূমিকা।

২.১. রাজনীতি প্রচারের অন্যান্য মাধ্যম।

২.২. গণমাধ্যম হিসাবে রাজনৈতিক ছড়ার ভূমিকা।

তৃতীয় অধ্যায়- রাজনৈতিক ছড়ার ছড়াকার।

৩.১. অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া।

৩.২. লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া।

ক. শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর।

খ. অন্নদাশঙ্কর রায়।

গ. সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

ঘ. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঙ. শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

চ. শঙ্খ ঘোষ।

ছ. জয়দেব বসু।

জ. বিবিধ।

চতুর্থ অধ্যায়- নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়া: পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫২-২০১৬)।

৪.১. সাধারণ নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক কিছু কথা।

৪.২. কংগ্রেস সরকার (১৯৫২-১৯৬৭)।

৪.৩. যুক্তফ্রন্ট সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসন (১৯৬৭-১৯৭২)।

৪.৪. সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার ও জরুরি অবস্থা (১৯৭২-১৯৭৭)।

৪.৫. বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০১১।

৪.৬. তৃণমূল সরকার (২০১১-২০১৬)।

পঞ্চম অধ্যায়- রাজনৈতিক ছড়ায় বাংলাদেশ।

৫.১. দেশভাগের প্রেক্ষিত।

৫.২. পাকিস্তানি শাসনে বাংলাদেশ।

৫.৩. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ।

৫.৪. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সাহিত্যগুণের নিরিখে রাজনৈতিক ছড়া।

৬.১. ছন্দনৈপুণ্য

৬.২. কবিত্বগুণ

৬.৩. চিত্রকল্প

৬.৪. নান্দনিকতা

উপসংহার

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১: নির্বাচন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের তালিকা

পরিশিষ্ট-২: রাজনৈতিক ছড়ার চিত্রপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

ভূমিকা

প্রায় প্রত্যেক দেশের লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ জুড়ে আছে ছড়া। দু'বাংলাতেও অনুরূপভাবে ছড়িয়ে আছে প্রচুর সংখ্যক ছড়া। জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় যোগের কারণে ছড়ার মধ্য দিয়ে দেশ-কাল-সমাজের চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে; তেমনি চিত্রিত হয়েছে মানুষের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য। ছড়া একই সঙ্গে অনেক গভীর আবার অত্যন্ত সরল ভাবনা বহন করে। আপাতভাবে মনে হতে পারে যে ছড়া শিশু মনোরঞ্জনের তাৎক্ষণিক তাগিদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে- এর ছন্দের দোলা, শব্দচয়ন, সবকিছুই বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই রচিত। কিন্তু ছড়ার গভীরে যে এর চেয়ে অধিক বক্তব্য বিষয় ধরা থাকে তা ছড়া নিয়ে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত আলোচনায় বারংবার উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে মৌলিক সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অন্তরের অকৃত্রিম আন্তরিকতা বশতই বাংলার লোকছড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আলোচনায় ব্রতী হয়ে ১৩০১ বঙ্গাব্দে রচনা করেছিলেন 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। 'ছেলেভুলানো ছড়া'র এমনতর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে রসিক বাঙালি পাঠকের নজরে পড়েনি। যতই যান্ত্রিক জীবনে আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি ততই বৈচিত্র্যে-র সন্ধানে তো বটেই তাছাড়াও নিজেদের মূলের সন্ধানের তাগিদে লোকসংস্কৃতির শরণাপন্ন হয়েছি। সেই সুবাদে লোকসাহিত্যের চর্চা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। লৌকিক ছড়ার বিবিধ বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে। স্বভাবতঃই এই চর্বিতচর্বণে না গিয়ে আমরা একটি নতুন বিষয় নির্বাচন করেছি। আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় 'বাংলা রাজনৈতিক ছড়া'।

বর্তমান গবেষেণাপত্রটি তৈরি হয়েছে নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়ার উদ্ভব ও বিকাশের পাশাপাশি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়াকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক ছড়াগুলি মূলত নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত হলেও এই সকল ছড়ার মধ্য দেশ-কাল-সমাজের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করা হল। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত ছড়ায় কিভাবে সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ থেকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে তা আলোচিত হল। এই গবেষণার উদ্দেশ্য দুই বাংলার রাজনৈতিক ছড়ার ভাষা ও আঙ্গিকগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলোনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা এবং একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ছড়াকে ব্যবহার করেন কেন, তার কারণ অনুসন্ধান করা। এর জন্য আমরা গ্রহণ করব ক্ষেত্রানুসন্ধান ও তুলনামূলক পদ্ধতি। তথ্য সংগ্রহের জন্য সাহায্য নেওয়া হল নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পার্টি ইস্তেহার, দেওয়াল লিখন, বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ইন্টারনেটের।

তবে আমাদের আলোচ্য রাজনৈতিক ছড়া আর লৌকিক ছড়া সমগোত্রীয় নয়, এই কথাটি প্রথমে স্পষ্ট করে বলা দরকার। লোকছড়া লোকসমাজের মৌখিক সৃষ্টি কিন্তু রাজনৈতিক ছড়া কোন গোষ্ঠীর দ্বারা তৈরি হয় না এবং কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। রাজনৈতিক ছড়া লেখাপড়া জানা মননশীল মানুষের লিখিত রচনা, যা গ্রাম-শহর নির্বিশেষে নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচার ও প্রসার লাভ করে থাকে। রাজনৈতিক ছড়া শোষিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত মানুষের শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য রচিত। জনমত গঠন এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল ছড়ার ভাষা,

শব্দ প্রয়োগ এবং ভাবনা চিন্তা সবই সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের দ্বারা নির্মিত। তাই রাজনৈতিক ছড়াকে আমরা পরিশীলিত মনন ও চিন্তনের প্রকাশ বলতে পারি।

প্রথম অধ্যায় 'রাজনৈতিক ছড়া উদ্ভবের প্রেক্ষিত'। এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে বাংলা রাজনৈতিক ছড়া উদ্ভবের নানা প্রেক্ষিত। এর পাশাপাশি বাংলা লোকছড়ার সাথে রাজনৈতিক ছড়ার পার্থক্য আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিকে দুটি উপ-অধ্যায়ে বিভাজন করা হল- ১.১. বাংলা ছড়ায় ইতিহাস: পলাশি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

১.২. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডে পরিণত হচ্ছে তখন থেকেই বাংলায় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রচলিত অনেক ছড়ায় রাজনৈতিক ইতিহাস ধরা পড়েছে, যা পর্যায়ক্রমে দুটি পর্বে আলোচনা করা হল।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'রাজনীতি: প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির প্রেক্ষিতে ছড়ার ভূমিকা'। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আধুনিক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে ছড়ার মত প্রাচীন আঙ্গিকের ব্যবহার কতটা প্রাসঙ্গিক। এছাড়া রাজনৈতিক ছড়াগুলির গণমাধ্যম হিসাবে গৃহীত হওয়ার যোগ্যতা এবং একবিংশ শতাব্দীতে সোশ্যাল মিডিয়ার রমরমা সত্ত্বেও নির্বাচনের প্রাক্কালে দুই বাংলায় রাজনৈতিক ছড়ার ব্যবহার সমান জনপ্রিয়, তার কারণ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হল।

তৃতীয় অধ্যায় 'রাজনৈতিক ছড়ার ছড়াকার'। রাজনৈতিক ছড়ার ছড়াকারদের নিয়ে আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়টি। মূলত দু-ভাবে এই সকল ছড়া সৃষ্টি হয়ে থাকে, যথা- অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া। নির্বাচনের আগে দেওয়াল জুড়ে যে সকল রাজনৈতিক ছড়া লেখা হয়, তার রচয়িতার উল্লেখ থাকে না, স্বাভাবিকভাবে এই সকল ছড়ার রচয়িতাগণকে অজ্ঞাতনামা ছড়াকার হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এই সকল দেওয়াল লিখনের ছড়া নিয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। মূলত লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারদের নিয়ে এই অধ্যায়টি আলোচিত হয়েছে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে নির্বাচিত কয়েকজন ছড়াকারকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল, তাঁরা হলেন- শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ। এছাড়া আরও অনেকেই রাজনৈতিক ছড়া লিখেছেন বিশেষ করে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অমিতাভ চৌধুরী, জর্জ মীরজাফর গোস্বামী.. প্রমুখ ছড়াকারগণের রচিত রাজনৈতিক ছড়া 'বিবিধে'র মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় 'নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়া: পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫২-২০১৬)'। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম অংশে থাকবে স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক কিছু কথা। দ্বিতীয় অংশে থাকবে ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন থেকে ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রচিত রাজনৈতিক ছড়ায় সমকালীন

রাজনীতির প্রসঙ্গ কিভাবে এসেছে তা আলোচিত হবে। দ্বিতীয় অংশের মূল আলোচনাটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হবে, যথা- ১. কংগ্রেস সরকার (১৯৫২-১৯৬৭)। ২. যুক্তফ্রন্ট সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসন (১৯৬৭-১৯৭২)। ৩. সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার ও জরুরি অবস্থা (১৯৭২-১৯৭৭)। ৪. বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০১১)। ৫. বর্তমান তৃণমূল সরকার (২০১১-২০১৬)। এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে ১৯৫২-২০১৬ পর্যন্ত সময়পর্বে পশ্চিমবঙ্গের শাসক ও বিরোধী দলের অবস্থান চিহ্নিত হবে। মূলত নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রায় সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারের একটি অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে ছড়াকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি কেন প্রচার মাধ্যম হিসাবে আজও ছড়ার মত পরিচিত আঙ্গিককে ব্যবহার করেন? তার কারণ চিহ্নিত করা হবে। পাশাপাশি এই সকল ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে যে, রাজনৈতিক ছড়ায় কেবল রাজনীতিই থাকে না, মাখামাখি করে থাকে ইতিহাস ও আর্থসামাজিক অভিঘাত।

পঞ্চম অধ্যায় 'রাজনৈতিক ছড়ায় বাংলাদেশ'। এই অধ্যায়ের আলোচনাকে আমরা বিভক্ত করতে চাই চারটি অংশে। যার প্রথম অংশে থাকবে দেশভাগের প্রেক্ষিতে রচিত রাজনৈতিক ছড়ার বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হবে পাকিস্তানি শাসনে বাংলাদেশের জনজীবনে যে সংকট তৈরি হয়েছিল, তা কিভাবে ছড়ার মধ্যে ধরা পড়েছে। তৃতীয় অংশে আলোচিত হবে রাজনৈতিক ছড়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। চতুর্থ অংশে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত রাজনৈতিক ছড়ায় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত আলোচিত হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় 'সাহিত্যগুণের নিরিখে রাজনৈতিক ছড়া'। আগের অধ্যায়গুলির মত এই অধ্যায়টিকেও চারটি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম অংশে থাকবে 'ছন্দনৈপুণ্য' এই সংরূপটিতে আলোচিত হবে রাজনৈতিক ছড়ায় ব্যবহৃত ছন্দ। দ্বিতীয় অংশে কবিত্বগুণ, চিত্রকল্প এবং নান্দনিকতার নিরিখে রাজনৈতিক ছড়াগুলি কতটা সাহিত্যগুণমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তা আলোচিত হবে। পাশাপাশি এই সকল ছড়ার কিছু কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে যা চিহ্নিত করা হবে।

বাংলা ছড়ার বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ 'বাংলা রাজনৈতিক ছড়া'র বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়াস আমরা করেছি। আমাদের এই প্রয়াস যদি পরবর্তীকালের গবেষণাকে সামান্যতমও ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করে তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থক।

প্রথম অধ্যায়: রাজনৈতিক ছড়ার ইতিহাস

সংস্কৃতিকে আমরা সৃষ্টি বলে মানি আর লোকসংস্কৃতিকে পরম্পরাগত সৃষ্টি হিসেবে। এই যে দেখার তফাৎ, সংজ্ঞার বিভিন্নতা, ধারণার হেরফের তা যে সমাজ-সময় নিরপেক্ষ নয়, তা বোধ হয় আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সংস্কৃতির মানচিত্র নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাদের জানা হয়ে গেছে যে শুধু লোকসংস্কৃতিই নয়, সব সংস্কৃতিই পরম্পরাগত। কিছু সুবিধা হবে ভেবেই আমরা নানা বিভাজন করে থাকি, নইলে সবই ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই থাকে মূল্যবোধের ও ভাবাদর্শের প্রসার, যার নানা ধাপ, যে ধাপ নির্ধারিত হয় সময় ও প্রতিবেশের চাপে এবং মূল্যবোধের প্রয়োগেই

কাউকে বলছি সংস্কৃতি, ভদ্রজনের সৃষ্টি, কাউকে বলা হয় 'লোকসংস্কৃতি' যা পরিশীলিত নয়, ভদ্রজনের নয়। সাধারণ রাজনীতির সঙ্গী যে 'সাংস্কৃতিক রাজনীতি' তাই-ই নির্দিষ্ট করে এই সব ধাপ-ধারণা ও অভিধার বিভাজন।

লোকসংস্কৃতিবিদদের জানার কথা যে লোকসংস্কৃতি আর শুধুই গ্রামীণ কৃষিজীবীদের সংস্কৃতি নয়। লোকসংস্কৃতির মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় তো শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতিও গ্রাহ্য। কর্ম সঙ্গীত এখন স্বীকৃত লোকসঙ্গীত। মার্কসবাদ বিরোধী পণ্ডিতেরাও এটা মানতে বাধ্য হয়েছেন। আর প্রতিবাদী লোকসংস্কৃতি! তাতো শ্রমিক বলেই বেশি পাওয়া যাবে। সে কৃষি শ্রমিকই হোক বা কারখানার শ্রমিক। প্রথম যখন লোকসংস্কৃতির ক্রিয়া বা function আলোচিত হয় তখন প্রতিবাদ কিন্তু একটি ক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। পরে যুক্ত হয়েছে, আজ স্বীকৃত। কখন এই পরিবর্তন ঘটল? যখন গ্রাম শহরের সীমা ভেঙে যাচ্ছে, যখন শহুরে শ্রমিক শ্রেণি গড়ে উঠেছে, প্রতিবাদ জোরদার হয়েছে। সংস্কৃতি যে নিত্য পরিবর্তন শীল এবং নিত্য সৃষ্টিশীল তা আমরা অনেক সময় মানতে চাই না। মানলে লোক ও সংস্কৃতি উভয়েরই সংজ্ঞা পাল্টে যায়। এমনকি গ্রাম শহরের সীমানাও কি ভেঙে যায় না? উনিশ শতকে মূলত জাতীয়তা বোধের তাগিদে লোকসংস্কৃতি চর্চার শুরু। সঙ্গত কারণেই তা ছিল সংগ্রহের পর্ব, তুলে আনার, মর্যাদা দেওয়ার পর্ব এবং সেই তাগিদে কিছু পদ্ধতি, কিছু তত্ত্ব, কিছু সংজ্ঞার নির্মাণ ঘটে। আজ কিন্তু লোকসংস্কৃতিচর্চা সেই জায়গা থেকে সরে এসেছে। সরতে বাধ্য, কারণ লোকসংস্কৃতিই নানা পরিবর্তনের মুখোমুখি। এই সত্য জানার ফলেই বদল হচ্ছে সংজ্ঞা, তত্ত্ব ও পদ্ধতি। আজকের চর্চায় এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা জানা চাই। এ প্রসঙ্গে দিব্যজ্যোতি মজুমদার বলেছেন: 'লোকসংস্কৃতির উদ্ভব শুধুমাত্র গ্রামীণ জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, নগর জীবনেও সংস্কৃতি অহরহ গড়ে উঠেছে'।১ উক্ত মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। কারণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে বিভেদেরই প্ররোচনা দিক না কেন, সংস্কৃতির অন্তর্বিলীন কাঠামোর মধ্যে বস্তুত পক্ষে সে ধরনের কোন বিচ্ছিন্নতাই কিন্তু নেই। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংস্কৃতি আর শহরের পরিশীলিত আধুনিক কৃষ্টিকলার মধ্যে সম্পর্কটা প্রভেদের নয়, বিবর্তনের। আর এই পরিবর্তনের হাত ধরেই ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডে পরিণত হচ্ছে তখন থেকেই বাংলায় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে রাজনৈতিক ইতিহাস ধরা পড়ছে প্রচলিত অনেক ছড়ায়।

বাংলার বিভিন্ন যুগের বিপ্লবের ইতিহাসের পশ্চাৎভূমিতে (hinterland) এমনি ধরনের অজস্র ছড়া পাওয়া যাবে, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন গান ও ছড়ায় সমসাময়িক ইতিহাস ধরা পড়ে, সেগুলিই কালক্রমে সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্পদ হয়ে দাঁড়ায় ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত আমাদের অতিপরিচিত একটি ছড়ার উল্লেখ করতে পারি সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময়ে গ্রাম শহর নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখে মুখে ঘুরত তা হল-

সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি,

বোম ফেলেছে জাপানি।

বোমের মধ্যে কেউটে সাপ,

ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ।[১]

বিদেশী ইংরেজ শাসকের অত্যাচার সাধারণ মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। তাই ১৯৪২ খ্রীঃ জাপানি শক্তির আক্রমণ ও কলকাতার উপর বোমা বর্ষণের মত ঘটনায় মুক্তিকামী বাঙালি খুশি হয়েছিল। কিন্তু জাপানের আক্রমণকে স্বাগত জানানোর পিছনে এটাই একমাত্র কারণ ছিল না। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাঙালির হৃদয় পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দূর্জয় আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের মত শুভ বার্তা। জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের এমন শুভ উত্থানে আর ব্রিটিশ শক্তির পর্যুদস্ত অবস্থা দেখে ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ, শব্দ গুচ্ছের বারবার উচ্চারণের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে লোকতৃপ্তি।

'বাংলা রাজনৈতিক ছড়া' অলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে তা হল- এই সকল ছড়াগুলি কী লৌকিক ছড়া? না পরিশীলিত ছড়া? স্বাভাবিক ভাবে মনের মধ্যে একটা সংশয় থেকে যায়। তবে লোকসংস্কৃতিবিদদের মতে লোকছড়া হতে গেলে যে সব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার বেশির ভাগই রাজনৈতিক ছড়ার মধ্যে নেই। যেমন- রাজনৈতিক ছড়াগুলির রচয়িতার সন্ধান প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সাধারণ পাঠক জানতে পারেন যে, এগুলি কোন দলের দ্বারা লিখিত বা রচিত এগুলি শিশু মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয় না, এগুলি রচিত হয় প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রাপ্ত জনগণের কথা মাথায় রেখে। লোকছড়ার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য অসংলগ্ন চিত্রের সমাবেশ। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন-

খোকা গেল মাছ ধরতে,

ক্ষীর নদীর কূলে।

ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে,

মাছ নিয়ে গেল চিলে।

মাছটা চিলে নিয়ে গেল এটা আমাদের সকলের জানা কিন্তু ছিপটি কেন কোলাব্যাঙে নিয়ে গেল তা আমাদের জানা নেই। এই ধরনের অসংলগ্ন চিত্র লোক ছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পরিশীলিত ছড়ার ক্ষেত্রে অসংলগ্ন চিত্রের কোন স্থান নেই। বাংলা রাজনৈতিক ছড়ার ক্ষেত্রে এর অন্যথা ঘটেনি। যেমন: ভাইয়ের আয়ু বাড়বে বলে,

ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষণ।

বোনের জন্য থাকে কেবল ,

ইভটিজিং আর ধর্ষণ।[২]

উক্ত ছড়াটি ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সি.পি.আই.এম-র রচিত। বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান, নিরাপত্তা এবং মানুষের মানসিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ধরা পড়েছে উক্ত ছড়ায়। এছাড়া নারী নিরাপত্তা ও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার বেহাল দশা নিয়ে শাসক দলকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এখানে কোন অসংলগ্ন চিত্র নেই। লোকছড়াগুলি মূলত মুখে মুখে প্রচার ও প্রসার লাভ করে, তার লিখিত রূপ পাওয়া যায়না। পরবর্তী কালে অনেক লোকসংস্কৃতিবিদ সেগুলি সংগ্রহ করে একটা লিখিত রূপদান করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক ছড়াগুলি লিখিত আকারেই প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সর্বপরি এই সকল ছড়ার ভাষা, শব্দ প্রয়োগ এবং ভাবনা-চিন্তা সবই সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের দ্বারা নির্মিত। তাই এই সকল রাজনৈতিক ছড়াগুলিকে পরিশীলিত মনন ও চিন্তনের প্রকাশ বলতে পারি।

১৯৫৪ সালে উইলিয়াম ব্যাসকম Four Functions of Folklore শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এমন নয় যে, Functionalism বা উপযোগিতাবাদ বা কার্যকারিতাবাদের চর্চা এই প্রথম হল; অনেক আগেই বিশেষত নৃতত্ত্বের এই চর্চা ঘটেছে। এমনকি লোকসংস্কৃতির আলোচনায়, মিথ ব্যাখ্যায়, ব্রনিসল মালিনোওস্কি এই তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রয়োগে জানান যে মিথ এর প্রধান উপযোগিতা হল পরম্পরা বা ট্র্যাডিশনের প্রতিষ্ঠা। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত রচনা, Myth in primitive psychology –তে মালিনোওস্কি এই উক্তি করেন। ব্যাসকমের প্রবন্ধটি এই ধারাতেই একটি সংযোগ হিসেবে মেনে নেওয়া যায় যদিও তফাৎ কিছু আছে। 'লোক' বলতে সেই সময়ের গৃহীত ও প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি বুঝতেন গ্রামীণ কৃষি সমাজের মানুষজন। এর কিছু কাল পর, ১৯৬৪ সালে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর নির্ধারিত চারটি উপযোগিতার বাইরে আরো দু'একটি তাঁর জানা ছিল না; ১৯৫৪-তে তাই সেগুলি তাঁর মনোযোগ এড়িয়ে গেছে। তিনি বলেন, তখন বোঝা যায়নি যে ভার্বাল আর্ট-এর রাজনৈতিক ব্যবহারযোগ্যতাও আছে আর তা অনেক সময় রাজনৈতিক প্রয়োজন ও সমাজ পরিবর্তনের তাগিদে ব্যবহার হতে পারে। এমনকি হাতিয়ার ও হতে পারে। এই প্রক্রিয়া উত্তর-উপনিবেশিক পৃথিবীতে একটি প্রধান লক্ষণ। ব্যাসকম স্বীকার করলেন যে এই সংবাদটি পান নিউইয়র্কের আফ্রিকান স্টাডিজ অ্যসোসিয়েশনের একটি সভার আলোচনা সূত্রে। ইতিমধ্যে ১৯৬২ সালে এই বিষয়ে রিচার্ড ডরসনও একটি প্রবন্ধ লেখেন। এরপর ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত International Encyclopedia of Social Science-এ Folklore শিরোনামে তাঁর প্রবন্ধে ব্যাসকম লিখলেন: 'Despite the fact that verbal art serves to continue and stabilize culture, it has also been used for the purpose of political propaganda and social change. During the emergence of the independent nations of Africa, myths, legends and song texts have been used to promote ethnic unity, regionalism, nationalism, anti-colonialism and pan-Africanism'.[৩]

এমনটা যে শুধু আফ্রিকায় ঘটল তা নয়। এমনকি এই প্রক্রিয়া যে অতি-সাম্প্রতিক তাও নয়। ব্যাসকমদের নজরে এসেছে হয়ত গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। তবে এটা ঠিক যে প্রক্রিয়াটি জোরদার হয়েছে গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে, আফ্রিকা-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পরাজয়ে। আর এই সময়েই জাতিসত্তা, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদির ব্যাপকতা দেখা গেছে

নানা দেশে, ভারতবর্ষেও তার অন্যথা ঘটেনি। আর রাজনৈতিক-সামাজিক এই পরিবর্তনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগও হয়েছে ব্যাপকতর, শুধু ব্যবহারেই নয়, নির্মাণ ও প্রসারেও।

বিশ শতকে পৌঁছে শ্রমজীবী মানুষ যত বেশি সংঘটিত হয়েছে, ততই তীব্র হয়েছে এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। শুধু ইউরোপ আমেরিকায় নয় ভারতবর্ষেও। সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই জাতীয়তাবাদী গণসঙ্গীত ও ছড়া তৈরি হয়েছে, রচয়িতা অনাম্মী কথাকার ও চারণ কবিরা। যেমন- স্বদেশী আন্দোলনের সময় একটি কবাডিখেলার ছড়াতে পাওয়া যায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ:

চিত কবাডি চিত্

হবে মোদের জিত্

ভাঙছে কংসরাজার ভিত্...

চিত কবাডি লালবাজার

লাল পাগড়ি হাজার হাজার

চিত্ কবাডি দাও ফেলে

চিত্ কবাডি কাছে এলে

ল্যাং মেরে দাও মার

জিত্ ভারত মাতার।[৪]

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যত বেড়েছে, সে আন্দোলনে এই ধরনের ছড়ার ব্যবহার ততই বেড়েছে। মূলত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলা রাজনৈতিক ছড়ার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকাল ও তার পরেও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও সাম্যবাদী আন্দোলনেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচনেও আধুনিক আঙ্গিকে এই সকল রাজনৈতিক ছড়া ব্যবহৃত হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে। বর্তমানে এই সকল রাজনৈতিক ছড়াগুলি রচিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি আদর্শকে তুলে ধরার জন্য এবং শাসক দলের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যাপক ভাবে রাজনৈতিক ছড়ার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসক কিংবা বিরোধী উভয় দলই পক্ষে-বিপক্ষে এই ধরনের ছড়ায় দেওয়াল ভরিয়ে তোলেন এবং দেওয়াল দখলের যুদ্ধে মেতে ওঠেন। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর সৌমেন সেন মহাশয়ের একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক: 'নির্বাচন কালে কত ছড়া, গান যে বাংলায় লেখা হয় তার হিসেব রাখা হয়নি। গত কয়েকটি নির্বাচনে দেওয়াল লিখনতো রীতিমত শিল্প হয়ে উঠেছে, আর সেই

দেওয়াল লিপির ছড়া, কার্টুন বাংলার নির্বাচন-প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার। রাজনীতিতে এই ছড়া, কার্টুনের বিষয় অনেক বক্তৃতার তুলনায় শক্তিশালী'।[৫]

দ্বিতীয় অধ্যায়- রাজনীতি: প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির প্রেক্ষিতে ছড়ার ভূমিকা

সংযোগের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম মাসমিডিয়া বা গণমাধ্যম। এই গণমাধ্যমের শক্তির শেষ নেই, দিনের পর দিন প্রযুক্তির উন্নতির ফলে তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটছে অবিশ্বাস্য গতিতে। প্রযুক্তি আমদানির ক্ষেত্রে কিছু দেশ একটা অসাধারণ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে এবং সেই সূত্রে গণমাধ্যমের রকমারি আধুনিক ব্যবস্থা আজ আমাদের শুধু পরিচিত নয়, আমাদের সকলেরই প্রায় কম-বেশি আয়ত্তের মধ্যে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্বাচন অপরিহার্য আর সেই নির্বাচনী প্রচারে গণমাধ্যম যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে অথবা নিজের দল, নিজের নেতা বা নেত্রী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে কিংবা রাজনৈতিক আদর্শকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়। এই মাধ্যমগুলি হল- মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, শ্লোগান, পথনাটিকা, গণসঙ্গীত, নানারকমের সংবাদপত্র, পত্রিকা, পুস্তক, পার্টি ইস্তেহার, হ্যাণ্ডবিল, পথে প্রান্তরে প্রদর্শিত ব্যানার, হোর্ডিং, ফ্লেক্স, বেতার, দূরদর্শন, Social Media দেওয়াল লিখন ও রাজনৈতিক ছড়া। এই মাধ্যমগুলির নিরিখে প্রচারের ধরনও বদলে যায়।

মিটিং, মিছিল, শ্লোগান: জনমত গঠনের প্রত্যক্ষ নিদর্শন হল মিটিং, মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি। আর এই মিটিং মিছিলের অপরিহার্য অংশ হল শ্লোগান। মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে দলীয় নেতা-নেত্রীগণ সাধারণ দলীয় কর্মীদেরকে একত্রিত করেন বা সংঘবদ্ধ করেন। মিছিলের অগ্রভাগে শীর্ষস্থানীয় নেতা বা নেত্রী শ্লোগান আওড়াতে থাকেন আর সাধারণ কর্মীগণ ধুয়োধরার মতো সেই শ্লোগানের পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। এইভাবে মিছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। এই শ্লোগান গুলি রচিত হয় যে কোন সামাজিক সমস্যাকে উপজীব্য করে, বিরুদ্ধ দলকে আক্রমণ করে কিংবা দলীয় নীতি আদর্শকে মান্যতা দিয়ে। রাজনৈতিক জনসভা বা সমাবেশে শীর্ষস্থানীয় নেতা নেতৃগণ তাদের তীক্ষ্ণ ভাষণের দ্বারা দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্বুদ্ধ করেন, তাদের মনোবল বাড়ান, দলীয় নীতি আদর্শের পথে চালিত করেন এবং ঐক্যবদ্ধ করেন।

বেতার ও দূরদর্শন: ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন এবং বহু গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। বেতার মাধ্যম সেখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। গ্রামের মানুষ আজও বেতারের সাহায্যে দেশ বিদেশের খবরাখবর পেয়ে থাকেন। যদিও প্রায় প্রত্যেক মোবাইলে এফ. এম.

রেডিও থাকায় বর্তমানে রেডিও-র প্রচলন অনেক বেশি সহজলভ্য হয়েছে। আবার দুর্গম স্থানে খবর পৌঁছে দিতে বেতার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কারণে রাজনৈতিক বক্তব্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বেতার মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়।

দূরদর্শনের সাহায্যে কোন সংবাদ দর্শক বা শ্রোতার কাছে দৃশ্য এবং শ্রাব্য উভয় ভাবেই পৌঁছে দেওয়া যায়। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দূরদর্শন অত্যধিক জনপ্রিয় একটি গণমাধ্যম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে কোন বক্তব্য খুব সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দূরদর্শনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক প্রচারেও যে দূরদর্শনের সাহায্য নেওয়া হবে সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিগত কয়েকটি নির্বাচনে প্রায় সব দলেরই কোন না কোন প্রার্থী তথা প্রতীক চিহ্নের ছবি ছেপে ভোট প্রার্থনা করা হয়েছে। ২০০১ থেকে বৈদ্যুতিন চ্যানেলের ক্রম বৃদ্ধিতে ২০০৬ বিধানসভা নির্বাচন, ২০০৯ লোকসভা নির্বাচন, ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে রেডিও ও দূরদর্শন মাধ্যমেও দলের ভোট প্রার্থী ও প্রতীক চিহ্ন দিয়ে বিজ্ঞাপন হয়েছে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে ২০১৪ লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনে Social Media অর্থাৎ twitter, what'sApp, Facebook, Messenger এর মাধ্যমেও নির্বাচনী প্রচার করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ সংসদীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রাক্‌লগ্নে এত বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের রমরমা ছিলনা, তখন নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম মাধ্যম ছিল রাজনৈতিক ছড়া। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৈদ্যুতিন অর্থাৎ টিভি, রেডিও, মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার সহজলভ্য হলেও নির্বাচনী প্রচারে বাংলা রাজনৈতিক ছড়া তার ঐতিহ্য হারায়নি বরং আগের তুলনায় আরো বেশি মাত্রায় দেওয়াল লিখন লক্ষ্য করা যায়। ছড়ার অন্তর্নিহিত গুণের জন্যেই বিভিন্ন কাজে ছড়ার ব্যবহার হয় বহুদিন ধরে— প্রচারের কাজে তো বটেই। সুতরাং নির্বাচনের কাজে ছড়া তো ব্যবহার হবেই। তবে পশ্চিমবাংলাতেই ছড়ার ব্যবহার বেশি। অসম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশেও নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচারের কাজে ছড়ার চলন আছে। তবে পশ্চিমবাংলার মত ব্যাপক নয়। যেমন— ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের সময় জোড়া বলদের দল কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন:

জোড়া বলদ টানছে মই,

উড়কি ধানের মুড়কি খই।

জোড়া বলদ করছে চাষ,

দ্বিগুণ ফসল বারোমাস।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বিরুদ্ধ দলের দেওয়াল লিখনঃ

জোড়া বলদ মারছে লাথ,

গরিবের নাই পেটে ভাত।

কোথায় দুধ কোথায় দই,

গাছে তুলে কাড়ছে মই। ৬

শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা বিশেষ রাজনৈতিক দলের জনদরদী ভূমিকার অন্তরালে যে শোষকের ভূমিকা সেই স্বরূপকে চিহ্নিত করতে, বিশেষত নির্বাচনের সময় ভোটারদের আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক ছড়ার সৃষ্টি। প্রশ্ন উঠবে রাজনৈতিক দলগুলি কেন প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বিশেষ করে ছড়াকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন? এর উত্তর খুব সহজ ও স্পষ্ট। এর গণমাধ্যম রূপে গৃহীত হবার যোগ্যতা। ছড়া মানেই ছন্দবদ্ধ রচনা। যা ছন্দবদ্ধ তা সহজেই পাঠকের বা শ্রোতার মনে গাঁথা হয়ে যায়। শত বক্তৃতাতে কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক প্রচারে যে কাজ না হয় দু-চার পংক্তির ছড়ায় তার বহু গুণ ফল মেলে। ছড়ার আঙ্গিকটি সাধারণের কাছে পরিচিত। কেবল সেই আঙ্গিকের সাহায্যে রাজনৈতিক বক্তব্যকে উপস্থাপন করা হয়। গদ্যের নিরসতা মুক্ত, এর ব্যঞ্জনা সুদূর প্রসারি, তাছাড়া দুটি বা চারটি পংক্তিতে যে কথা বলা হয় তা পাঠক বা শ্রোতার মনে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে, বক্তব্য মরমে গিয়ে প্রবেশ করে এবং সহজে আর বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাই কি দুই বাংলায় রাজনৈতিক ছড়ার এত প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়- রাজনৈতিক ছড়ার ছড়াকার

রাজনৈতিক ছড়ার ব্যবহার দেওয়াল লিখনে লক্ষ্য করা গেলেও প্রতিষ্ঠিত কবির দ্বারা ও প্রচুর রাজনৈতিক ছড়া মুদ্রিত হতে দেখা যায়। রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত মানুষের কাছে চিত্তবিনোদনের এক বিশ্বস্ত মাধ্যম রাজনৈতিক ছড়া। বাংলা ছড়াগুলি কেবলমাত্র ছেলেভুলানো ছড়া, নর-নারী কেন্দ্রিক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ছড়ার প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় বাংলা ছড়ায় যেমন রসবোধ, সহজ-সরল প্রাঞ্জল ভাষার বুনন আছে তেমনি মানুষকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতাও আছে। সাম্প্রতিক দুই বাংলার রাজনৈতিক ছড়ায় সমকালীন জীবন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে ছড়া অর্থপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হচ্ছে। ছড়ার মধ্যে যে সমাজ-ইতিহাসের উপাদান রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ, পরে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে সেটি প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি লিখলেন- " বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত

আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজ ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে..."।[৯] অর্থাৎ ছড়ার মধ্যে সমাজ ইতিহাস লুকিয়ে থাকে তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। আবার অনেক সময় ছড়ায় রাজনৈতিক উত্থান পতন কিংবা সামাজিক মূল্যবোধের জন্ম হচ্ছে। এমনকি ছড়ার ছন্দে রচিত হচ্ছে রাজনৈতিক গান কিংবা শ্লোগান। সাধারণত এসব গান কিংবা শ্লোগানে থাকে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ইঙ্গিতপূর্ণ চটকদারি কথামালা। এগুলোকে অনেকেই হয়ত মূল্যায়ন চাইবেন না, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে মৌখিকভাবে শ্লোগান সদৃশ ছড়াগুলিতে তির্যক বিদ্রুপবাণ ও লোকসাধারণের এক কৌতুকপূর্ণ রসবোধের পরিচয় বিদ্যমান। অতএব বোঝা যায় সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলোও অর্থবোধে কালোপযোগী বিবর্তিত হচ্ছে এবং এর সংজ্ঞা দানেও এসেছে যুগোপযোগী পরিবর্তন। এখন এই সকল রাজনৈতিক ছড়াগুলির উৎসের সন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মূলত দুটি পদ্ধতিতে এই সকল ছড়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। যথা-

১. অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া।

২. লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া।

দেওয়াল লিখনে যে সকল রাজনৈতিক ছড়া লক্ষ্য করা যায়, তার কোনটাতেই স্রষ্টার উল্লেখ থাকে না। কেবল মাত্র দলীয় প্রতীক চিহ্ন, প্রার্থীর নাম, দলের নাম ইত্যাদি থাকে। স্রষ্টার নাম অজ্ঞাত থাকে। যার ফলে এই সকল ছড়াগুলি কোন ব্যক্তি নামে প্রচারিত না হয়ে কেবলমাত্র দলের নামে প্রচার লাভ করে। তবে একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এই অজ্ঞাতনামা রচয়িতাগণ আর কেউ নন তাঁরা প্রত্যেকেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতাদর্শগত ভাবে যুক্ত। একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের একটি cultural front বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আছে। এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত সকল সদস্যগণ কোন না কোন ভাবে জনসংযোগের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের মধ্যে যেমন কেউ কবি, কেউ বা বড় নাট্যকার, অভিনেতা, খেলোয়াড়, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী(গায়ক), ডাক্তার, আমলা প্রমুখ ব্যক্তিগণ সমাজের অন্য সকলেরমত তাঁরাও কোন না কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী।

রাজনৈতিক ছড়ার ব্যবহার দেওয়াল লিখনে লক্ষ্য করা গেলেও প্রতিষ্ঠিত কবির দ্বারা ও প্রচুর রাজনৈতিক ছড়া মুদ্রিত হতে দেখা যায়। সচরাচর প্রাচীরের সীমিত পরিসরে রাজনৈতিক ছড়ার আত্মপ্রকাশ। পরিসর স্বল্প, তাই রাজনৈতিক ছড়া দীর্ঘায়িত হয় না, নানা বক্তব্য অথবা তথ্যে তা কণ্টকাকীর্ণ হয় না। জনমানসের কথা মনে রেখে নিতান্ত পরিচিত বক্তব্যকেই এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই সহজেই রাজনৈতিক ছড়া জনপ্রিয়তা লাভ করে। মানুষ এই সব ছড়া পাঠ করে বা শুনে বিচিত্র আনন্দ পায়। তীক্ষ্ণ শ্লেষ, ব্যঙ্গে এগুলি হয় মর্মভেদী। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে দেওয়াল লিখনের ছড়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

লোকছড়ার ক্ষেত্রে ব্যষ্টি নয়, সমষ্টিরই সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে একদা স্মৃতি নির্ভর এই ছড়া ছড়িয়ে গেছে পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে। সমষ্টিগত মানুষের সেই ছন্দিত ফসল আকর্ষণ করেছে আধুনিক কবিমানসকেও। ছড়ার আধারে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ছড়াকার হিসেবে সুকুমার রায়ের বহুল পরিচিতি। আবার অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া তাঁর উপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক কবি প্রতিভার বিপুল ও সমৃদ্ধ প্রকাশ ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে যায় জনপ্রিয়তায়। ছড়া লিখেছেন রবীন্দ্র পরবর্তীকালের সকল বড় কবিরাই- বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এমনকি তারও পরবর্তীকালে অমিতাভ চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখরা। ফলে গ্রামীণ ছড়ার আঙ্গিকে লেগেছে নাগরিক বৈদগ্ধ্য, লোকায়ত শিল্পে লেগেছে ব্যক্তিগত রং।

বাঙালি শিশু মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে মায়ের মুখের নানা প্রকার ছড়া-কবিতার যে রস পান করে থাকে তার সংস্কার সে কোন দিনই ভুলতে পারে না। কথাটি অসত্য নয়। শৈশবের সংস্কার পরবর্তী জীবনেও অনেকাংশে কার্যকর হয়। তাইত লৌকিক ছড়ার ভাব ভাষা, রূপ ও ছন্দ সাধারণ প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আধুনিক কালের কবি ও সুসাহিত্যিকগণকেও ছড়া রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। একালের শ্রেষ্ঠ ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে ছড়া বিষয়ে ধীমান দাশগুপ্তের একটি সাক্ষাৎকারের এক প্রশ্নের উত্তরে অন্নদাশঙ্কর বলেছেন-

“এটা তো আত্মস্বাতন্ত্র্যের যুগ। চেহারায় পোষাকে আচরণে সকলে প্রায় একরকম হলেও শিল্পে সাহিত্যে প্রত্যেকে নিজস্বতায় বিশ্বাসী। তাই আধুনিক ছড়ায় লোকছড়ার কালেক্টিভ সেন্সটা আর নেই। আজ প্রত্যেকের লেখার একটা ঢং এসেছে। মিল, ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রত্যেকের এক এক রকম। আমারটা পড়লে বোঝা যায় এটা আমার ছড়া। আবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়লে বোঝা যায় এটা কার ছড়া। সকলে মিলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে তবেই ছড়া বেঁচে থাকবে। নয়ত নয়”।[৭]

বাংলার সংস্কৃতি সহজ সরল, গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী। বাংলার ছড়াগুলোতে এই ঐতিহ্য, নান্দনিকতা, সামাজিক সচেতনতা সম্পৃক্ত বিষয়গুলো অবলীলায় প্রকাশিত হয়। ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কোন সামাজিক অবস্থা, অসামঞ্জস্য ও প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে এগুলো রচিত হয়েছে। আধুনিক ছড়াকারেরা তাঁদের রচনায় আনন্দ বিনোদনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে ছড়ার প্রায়োগিক দিক তুলে ধরছেন। মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে সচতেন করা, ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এই ছড়াগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৬ সালের ১৬ মে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে দু’খণ্ড করে ভারত ও পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব ঘোষণা করে। ৩রা জুন ভারতীয় নেতারা ভারত-বিভাজন প্রস্তাব মেনে নেন। ১৬ আগস্ট মুসলিমলীগ ভারতে ‘ডাইরেক্ট ডে অ্যাকশন’ পালন করে। ফলে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু মানুষের প্রাণ যায়। ২০ সেপ্টেম্বর নেহেরু ভারতের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের নেতা হন। ১৯৪৭ সালের ৫ জুলাই ব্রিটিশ সংসদে ভারতের স্বাধীনতা বিল এবং ১৮ জুলাই ভারতের স্বাধীনতা আইন অনুমোদন লাভ

করে। ১০ জুলাই প্রথম অশ্বেতকায় জিন্নাকে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করে ব্রিটিশ সরকার এবং ঘোষণা করা হয় জিন্না মুসলিম পরিষদের শাসক হবেন। এরপর ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয় বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশের বিভাজনের মধ্যে দিয়ে। দেশভাগের এই যন্ত্রণার মধ্যে ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা পায়, সাথে সাথে দেশ জুড়ে শুরু হয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা। সারা দেশ জুড়ে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস আর অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিকে ব্যঙ্গ করে ছড়াকার লিখছেন 'খুকু ও খোকা'(১৯৪৭) নামক তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ছড়া-

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাঙছে প্রদেশ ভাঙছে জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী!
তার বেলা?...

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা? [৮]

এই পর্বে আলোচিত হয়েছে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারেরা তাঁদের রচনায় আনন্দ বিনোদনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে ছড়ার প্রায়োগিক দিক তুলে ধরেছেন। বিশেষত মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে

সচেতন করা, ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এই সকল ছড়াগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এই ছড়াগুলি কোন রাজনৈতিক দলের প্রচারকার্যে ব্যবহৃত হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়- নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়া: পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫২-২০১৬)

ভোটদান-পদ্ধতি তথা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার কবে প্রথম সূত্রপাত হয় তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন মধ্যযুগে ইউরোপে এই ব্যবস্থা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। সে যুগেও সকল প্রতিনিধি-নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারত না, কেবল অভিজাত সম্প্রদায়, ভূস্বামী ও ধনী ব্যবসায়ীরা ছিলেন ভোটদানের অধিকারী। সুতরাং এসময়ে আইনসভাগুলি প্রকৃত অর্থে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না। মূলত উনিশ শতকে অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিক্ষার অগ্রগতির ফলে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হতে থাকে। ব্রিটেন ছিল এ ব্যাপারে পথিকৃৎ, ১৮৩২ সালে পার্লামেণ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক হয়। ১৮৬৭ সালে শিল্প-শ্রমিকেরা ভোটাধিকার লাভ করে। ব্রিটেনের অনুসরণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা তথা ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়। মহিলারা বহুদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকার পর তা লাভ করে। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার পবিত্র অধিকার বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতেও এর অন্যথা ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সাথে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সর্বজনীন ভোটাধিকার দানের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন এবং ভারতের সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। বস্তুত অন্যান্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ন্যায় ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা সমাজের 'সেফটি ভাল্ব' হিসাবে আজও কাজ করে চলেছে। এ প্রশ্নের জবাব মেলে ভারতের সংবিধানের ৩২৪ থেকে ৩২৯ নম্বর ধারায়। এই ধারাগুলিতে বলা হয়েছে, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয় জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পূর্বে ২১ বছর বয়স হলে প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য করা হত, ১৯৮৯ সালে ৬১তম সংবিধান সংশোধিত হবার পর বর্তমানে তার পরিবর্তে ১৮ বছর বয়সে প্রাপ্ত বয়স্ক বলে গণ্য হয়ে থাকে ও ভোটদানের অধিকারী হয়। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়ের কালসীমা নির্ধারন করা হল ১৯৫১- ২০১৬ পর্যন্ত।

আসলে ভোটের ঢাকে কাঠি পড়লেই দম ফেলার ফুরসত থাকে না ছোট বড় সকল দলের নেতাকর্মীদের। শুরু হয়ে যায় দেওয়াল দখলের লড়াই। ভোটের উত্তাপ বাড়তেই ছড়ার ছন্দে দেওয়াল মাতাতে চেষ্টার কসুর করেনা ছোট-বড় কোন দলই। শাসক-বিরোধী সকল দলই এসময় ছড়ার যুদ্ধে মেতে ওঠে।

স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশে প্রথম নির্বাচন হল ১৯৫২ সালে। বস্তুত বিরোধীদের বিক্ষোভ, আন্দোলন ও সমালোচনা সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রতিপত্তি থাকায়, ভোটারদের মধ্যে কোনোরকম

আপত্তিকর বা অসন্তোষজনক ঘটনা ঘটেনি ফলে ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ নির্বাচনে কংগ্রেস বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৫২- এর নির্বাচনে কংগ্রেস দখল করে মোট ২৩৮ টি আসনের মধ্যে ১৫১ টি, ১৯৫৭-এর নির্বাচনে মোট ২৫২ টি আসনের মধ্যে ১৫২ টি আসন এবং ১৯৬২-এর নির্বাচনে ২৫২ টি আসনের মধ্যে ১৫৭ টি। তবে এই তিনটি নির্বাচনে রাজ্য কংগ্রেস জয়ী হলেও তার জয় এসেছিল মূলত গ্রামাঞ্চলের ভোটারদের সমর্থনে। শহরাঞ্চলের ভোটারদের একটা বড় অংশ এই তিনটি নির্বাচনেই কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি। এর কারণ শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর বামপন্থীরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এবং নগরাঞ্চলের শিল্প- শ্রমিক শ্রেণীও বাম-রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস সম্পর্কে ক্রমশ বিরূপ হয়ে উঠছিল। সেই প্রথম নির্বাচনে দেওয়াল লিখন ছিল প্রকৃতপক্ষে বিরল, সেই সময় বামপন্থী দল তাদের প্রতীক চিহ্নে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে সর্বপ্রথম দুই লাইনের ছড়া লেখেন-

ভোট দেবেন কিসে,

কাস্তে ধানের শিষে।[৯]

আর সে সময় বাচ্চারা এর নকল করে বানিয়েছিল

ভোট দেবেন কিসে

আলুর দমের ডিসে।[১০]

১৯৫২ সালের নির্বাচনে উক্ত সুন্দর ছড়াটি মহেশতলা এলাকায় প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে কাস্তে ধানের শিষ ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রতীক।

১৯৭২-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। সে সময় শ্রী রায়ের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন বাম দলগুলি। যার নেতৃত্বে ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সহপাঠী এবং বন্ধু জ্যোতি বসু। সে সময় পুলিশের বিরুদ্ধে একটি শ্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তখন যেকোন মিছিলে পুলিশ প্রতিরোধের সামনে দাঁড়িয়ে বাম নেতা কর্মীরা শ্লোগান দিতেন- পুলিশ তুমি যতই মারো

মাইনে তোমার একশ বারো। [১১]

মিছিল নগরী বলে খ্যাত কলকাতার রাজনীতিতে শ্লোগানের একটা ধারাবাহিক ঐতিহ্য আছে। এই ঐতিহ্য আজকের নয়, দীর্ঘদিনের কখনও দেশীয় রাজনীতি কখনও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনা এবং চরিত্র নিয়ে রাজনৈতিক ছড়া তৈরি করেছিল কলকাতা।

নির্বাচন মানেই কি তত্ত্বের কচকচানি, বিরোধীদের কড়া সমালোচনায় কোণঠাসা করার চেষ্টা নাকি প্রতিশ্রুতির বন্যা? নিন্দুকেরা এসব বললেও নির্বাচনের সঙ্গে জুড়েছে কবিতা, ছড়া এবং সৃষ্টিশীলতার নানা দিক। সে দেওয়ালে রং দিয়ে প্রার্থীর প্রচার হোক বা মিছিলের নতুন ধরনের শ্লোগান। এ প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন-

> 'দেখুন আলকাতরানো দেওয়ালগুলো এখন চুন কালিতে ছয়লাপ। মশাইরা দাঁড়িয়ে যান খেলা হবে খেলা'।

কিংবা মনে পড়ে যেতে পারে-

দেওয়াল থেকে শিখতে হয়, দেওয়াল জানতে হয়

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে, দেওয়াল জুড়ে লিখতে হয়।

এই দেওয়ালের প্রচার যুদ্ধ তো আর ঘোড়ায় চড়ে হয় না। তাই ছড়ায় চড়ে হাজির হন প্রার্থীরা। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ব্যঙ্গ করে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরতে অস্ত্র হয় ছড়া। এ প্রসঙ্গে আবারও মনে পড়ে যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা-

লাগ লাগ করে লেগে যায়, এর ঢাল ওর তরোয়াল

ভোট কুড়নিরা কেড়ে নেয় ঘুটে কুড়নির দেওয়াল।[১২]

এটা প্রায় প্রত্যেক ভোটেই ঘটে থাকে। শহুরে কিংবা গ্রামের মানুষ উদাসীন কিংবা সিরিয়াস ভোটার, সকলের কাছে পৌঁছোতে ছড়ার চেয়ে নিশ্চিত অথচ সহজ পথ আর নেই। ছন্দের কারণেই তা মনে থেকে যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাজ্যে ভোট শুরু হলে চায়ের দোকান উত্তপ্ত হবে, দেওয়াল জুড়ে চুনকামের পোঁচ পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তাতে লাল, সবুজ, গেরুয়া নানা রঙের লড়াই। নানা ফুল, হাতুড়ি, কাস্তে, হাতের সমাহার। অবাক হলে চলবে কেন! রাজ্যে ভোট শুরু হয়েছে অথচ দেওয়াল শান্ত থাকবে তা কি করে হয়? ভোটের আঁচে তাও বর্ণময়, বিশেষ করে ছড়াময়। হাল সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার কিংবা চ্যানেলে প্রচার এসব এসেছে বটে কিন্তু সে আর কদিনের? এখনও ভোট প্রচারের ট্র্যাডিশনাল মাধ্যম তো দেওয়ালই।

পঞ্চম অধ্যায়- রাজনৈতিক ছড়ায় বাংলাদেশ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বিতর্কিত দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ববাংলা নাম নিয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কাল বাংলাদেশের ইতিহাসে 'পাকিস্তানি আমল'।

১৯৪৭-১৯৫৪ পর্যন্ত পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের শাসন অব্যাহত ছিল। মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জনমানস বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আমলা, গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সেনাবাহিনীর সমর্থনে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে অগণতান্ত্রিক ভাবে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, দেশে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা এবং পাঞ্জাবে গণ্ডগোলের অজুহাতে নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ববাংলায় বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন যুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ কঠিন বিবেচনা করে বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ঠা ডিসেম্বর কয়েকটি বিরোধী দলের সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি ঐক্যজোট গঠিত হয়। ফজলুল হক ইতিমধ্যে 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠন করেছিলেন। অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী মুসলিম লীগ সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খলভাবে আইনসঙ্গত উপায়ে আন্দোলন করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা চিন্তা করেন। তাঁর ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' বা জনগণের মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পরে এ দলের নাম থেকে 'মুসলিম' কথাটি বাদ দেওয়া হয় এবং নতুন নামকরণ হয় 'আওয়ামী লীগ'। পূর্ববাংলায় এ দল অল্প দিনের মধ্যেই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে 'যুক্তফ্রণ্ট' নামে যে ঐক্যজোট হয়েছিল তার দলগুলি হল- আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল। নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের প্রতীক ছিল 'নৌকা' এবং একুশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রণ্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। একুশ দফার মধ্যে দুটি বিশেষ দফা ছিল পূর্ববাংলার জন্য পূর্ণ সায়ত্ত্ব শাসন এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবি। বাঙালি জাতির জনক ও জাতীয়তাবাদের স্থপতি শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের দেওয়াল লিখন ছিল-

পদ্মা মেঘনা মধুমতি

নৌকা ছাড়া নাইকো গতি

নৌকার মাঝি মুজিব ভাই

আপনাদের কাছে দোয়া চাই।[১৩]

প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণ ভোট দেয় দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের আশায়। ভোটের সময় নেতারা নানারকম প্রতিশ্রুতি দেন। জনগণের সকল চাহিদা তাঁরা মেটাবেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করার পর জনগণের কাছে দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি ভুলে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন আর দুর্নীতিতে মত্ত হয়ে ওঠেন। তবে রাজনৈতিকভাবে সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। বাঙালি জাতি সবই পারে তাই তারা শপথ নিয়েছে আর কোন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হবে না। তাদের রচিত ছড়ায় সেই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে-

আর নয় দুর্নীতি

এবার হবে উন্নতি।[১৪]

ভোটাধিকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার প্রতিটি ভোটারের কর্তব্য। ভোটদানের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। সেখানে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বাধীন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সচেতনতামূলক দেওয়াল লিখন- ১. আমার ভোট আমি দেব

যাকে খুশি তাকে দেব।[১৫]

২. আমার ভোট আমি দেব

দেখে শুনে বুঝে দেব।[১৬]

দেশ পরিচালনা থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটের মাধ্যমে যোগ্য লোক নির্বাচন করা অতীব জরুরি। কারণ একজন যোগ্য শাসকই পারেন সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে। তাই নিজের একটি ভোটকে অবহেলা না করে প্রতিটি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে ছড়াটিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করে রচিত একটি ছড়া হল- বীর বাঙালি অস্ত্র ধর,

বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান,

আজিমপুর গোরস্থান।[১৭]

উক্ত রাজনৈতিক ছড়াগুলি ‘echo of the past’ হলেও কোন কোন সময় ‘vigorous voice of the present’ হিসেবেও ইতিহাসের মালমসলা প্রদান করতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সাহিত্যগুণের নিরিখে রাজনৈতিক ছড়া

সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যত্বের এই চুল-চেরা বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে ছড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে কাব্য-সাহিত্যের মাপকাঠিতে নিশ্চয় একথা বলা যায় যে, শব্দ মাধুর্য, ছন্দ প্রয়োগ, অলংকার সুষমা,

ধ্বনিঝংকার সব মিলিয়ে এক আস্বাদ্যময় শ্রুতিসুখকর রচনা হল ছড়া। স্বাভাবিকতা ও প্রাঞ্জলতা যদি কবিতার বৈশিষ্ট্য হয়, আধুনিক যুগের কাব্যরসিক পাঠক যদি তাতে কবিত্বের স্পর্শ পায়, তবে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ছড়ার মধ্যে কবিত্বের সন্ধান করা যায়।

আসলে এই ছড়ার ছন্দ বাঙালির, বাংলার একেবারে নিজস্ব ছন্দ, সংস্কৃত, প্রাকৃত কিংবা অপভ্রংশের স্পর্শরহিত নানান লৌকিক উৎস এর প্রাণ। এই ছন্দই পরম্পরায় বাহিত হয়ে শক্তিশালী করেছে পরবর্তীকালের কবিতার ছন্দের একটি ধারাকে। তাই আধুনিক পর্বে রচিত যে সৃজিত দলবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলি দেখি তার পূর্ব উৎস লৌকিক ছন্দই। অনুরূপ ভাবে বাংলা রাজনৈতিক ছড়াগুলি লোক আঙ্গিকের ছন্দ গ্রহণ করলেও শব্দচয়ন আধুনিক। নিম্নে রাজনৈতিক ছড়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম:

চিনের চিহ্ন/ কাস্তে হাতুড়ি ৪+৪

পাকিস্তানের তারা ৪+২

এখনো কি/ বলতে হবে ৪+৪

দেশের শত্রু/ কারা? ৪+২

(১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের অভিঘাত পড়েছিল ১৯৬৭ সালের নির্বাচনী ছড়ায়। উক্ত ছড়াটি তৎকালীন কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন।)

কাব্যসাহিত্যের ব্যঞ্জনা হল সুদূর প্রসারি। কিন্তু জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হল বাংলা রাজনৈতিক ছড়া। নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত এই সকল ছড়ায় মূলত তাৎক্ষনিকতাকে তুলে ধরা হয়। তাই এই ধরনের ছড়াগুলিতে পাশ্চাত্য Imagery-র আদর্শ এ স্বরূপের সঙ্গে সবটা মেলানো যায় না। তবে এদের চিত্রকল্পনায় যে সৌন্দর্য আছে তা সাধারণ ভাবে Imagery বা চিত্রকল্পই রচনা করেছে।

সবশেষে বলা যায় রাজনৈতিক ছড়ার নন্দনতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত, বিষয়গত নন্দনতত্ত্ব এর মধ্যে থাকলেও আঙ্গিকগত নন্দনতত্ত্বের অন্বেষণ অনেক সময়েই জটিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া ছন্দ, অলংকার, ধ্বনির কারুকার্য, জটিল চিত্রকল্প ইত্যাদি যে বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে নন্দনতত্ত্বের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে তার অনেকগুলিই এসব ছড়ায় অনুপস্থিত রয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ছড়ায় বিষয়গত নন্দনতত্ত্বের অন্বেষণ অনেক ক্ষেত্রে যেমন সহজ হয়ে যায়, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে জটিল। কেননা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হল রাজনৈতিক ছড়া, যা মূলত নিছক প্রয়োজনগত কারণে রচিত হয়ে থাকে। যেমন নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত

দেওয়াল লিখনের ছড়াগুলি, যেখানে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনটুকুই গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে। আবার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের দ্বারা রচিত রাজনৈতিক ছড়ার উপযোগিতা সুদূর প্রসারি সে কথা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

১. ২.পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তকবিপণি, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৫।

২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, রবিবাসরীয়, ভোটের ছড়া শীর্ষক আলোচনা, পৃ. ৯।

৩. সৌমেন সেন, লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য, পুনশ্চ, কলকাতা, পৃ. ১২৩।

৪. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নানা বিষয়ে হেটো ছড়া, বারোমাস, এপ্রিল-১৯৭৮।

৫. সৌমেন সেন, লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য, পুনশ্চ, কলকাতা, পৃ. ১২৮।

৬. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, আলাপ বিলাপ, কোরক, বাগুইয়াটি, কলকাতা-৫৯, ২০১২, পৃ. ৬৯।

৭. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশংকর রায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ (২০০৩)-এর ভূমিকা অংশে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত, পৃ. ২১.

৮. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৯-৫০।

৯. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৬৮।

১০. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭০।

১১. সুন্দরবন হাজী দেশারত কলেজের বটানির অধ্যাপক মাননীয় মতিউর রহমান মহাশয়ের স্মৃতি

১২. ছড়াসংগ্রহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা- প্রণব বিশ্বাস, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০১১, গ্রন্থপরিচয় ও প্রসঙ্গকথা, পৃ. ২২৭-২৩৮।

১৩. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ওমেহেদী হাসান, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদক- বরুণকুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-২০১৪, পৃ. ৪০১।

১৪. লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭৪।

১৫. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লা আল মামুদ, মোঃ মেহেদী হাসান ও লুবনা ইয়াসমিন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪০২।

১৬. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লা আল মামুদ, মোঃ মেহেদী হাসান ও লুবনা ইয়াসমিন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪০।

১৭. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ওমেহেদী হাসান, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদক- বরুণকুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-২০১৪, পৃ. ৪০১।

উপসংহার

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষত যেখানে বহুদলীয় প্রথা কায়েম আছে, সেখানে জনমত গঠনের, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের স্বরূপ উন্মোচনে কিংবা বিশেষ রাজনৈতিক দলের জনদরদী ভূমিকার অন্তরালে যে শোষকের ভূমিকা সেই স্বরূপকে চিহ্নিত করতে, বিশেষত নির্বাচনের সময় ভোটারদের আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক ছড়ার সৃষ্টি। এই সকল রাজনৈতিক ছড়ার অন্তরালে লুকিয়ে আছে সমসাময়িক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাদা পোশাকের পিছনে কালো মুখোশ, আর্থিক অনিয়ম, বেকারত্ব, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, নারী নির্যাতন, স্বজন-পোষণ, মূল্যবৃদ্ধি প্রমুখ জনবিরোধী কার্যকলাপের চিত্র। প্রশ্ন উঠবে রাজনৈতিক দলগুলি কেন প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বিশেষ করে ছড়াকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন? এর উত্তর খুব সহজ ও স্পষ্ট। এর গণমাধ্যম রূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্যতা। ছড়া মানেই ছন্দবদ্ধ রচনা। যা ছন্দবদ্ধ তা সহজেই পাঠক বা শ্রোতার মনে গাঁথা হয়ে যায়। শত বক্তৃতা কিংবা ইস্তেহার প্রকাশে যে কাজ না হয় দু-চার পঙ্‌ক্তির ছড়ায় তার বহুগুণ ফল মেলে। ছড়ার আঙ্গিকটি সাধারণের কাছে পরিচিত। কেবল সেই আঙ্গিকের সাহায্যে রাজনৈতিক বক্তব্যকে উপস্থাপন করা হয়। তাই শুধু বাংলায় নয়, বিদেশেও সমসাময়িক ঘটনা প্রাবল্যের থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি এমনকি নির্বাচনী প্রচারেও রাজনৈতিক ছড়ার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেলেও বাংলা রাজনৈতিক ছড়া নিয়ে ইতিপূর্বে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তাই এই সকল ছড়ার সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ আশু প্রয়োজন। কারণ রাজনৈতিক ছড়ার মধ্যে যে টুকরো টুকরো ছবি আছে তার মধ্যে নিহিত থাকে সমাজ, ইতিহাস ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এছাড়া এই ছড়াগুলি বহন করে সমাজ বিবর্তনের চিত্র।

প্রথম অধ্যায়টি গবেষণাকর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। সমগ্র গবেষণাকর্মটির মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে, বাংলা রাজনৈতিক ছড়ার উৎসের সন্ধান আবশ্যক। আর এই উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে। আমরা জানতে পেরেছি রাজনৈতিক ছড়াগুলি নির্দিষ্ট কোন 'লোক' বা 'গোষ্ঠীর' দ্বারা তৈরি হয় না, অথবা কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। অর্থাৎ রাজনৈতিক ছড়াগুলি লোক ছড়ার সমগোত্রীয় নয়, এই সকল ছড়া

সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য জনমত গঠন করা। মূলত এই ধরনের ছড়াগুলি নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত হয়। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে বিভেদেরই প্ররোচনা দিক না কেন, সংস্কৃতির অন্তর্বিলীন কাঠামোর মধ্যে বস্তুতপক্ষে সে ধরনের কোন বিচ্ছিন্নতাই নেই। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংস্কৃতি আর শহরের পরিশীলিত আধুনিক কৃষ্টি কলার মধ্যে সম্পর্কটা প্রভেদের নয় বিবর্তনের।

বিশ শতকে পৌঁছে শ্রমজীবী মানুষ যত বেশি সংগঠিত হয়েছে, ততই তীব্র হয়েছে এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। শুধু ইউরোপ আমেরিকায় নয়, ভারতবর্ষেও। বিশেষত বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে যখন আফ্রিকা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পরাজয় ঘটতে থাকে ঠিক তখনই জাতিসত্তা, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদির ব্যাপকতা দেখা গেছে নানা দেশে, ভারতবর্ষেও তার অন্যথা ঘটেনি। আর এই সময় থেকেই জাতীয়তাবাদী গণসঙ্গীত ও রাজনৈতিক ছড়ার উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। যদিও রাজনৈতিক ছড়ার উদ্ভবের সুনির্দিষ্ট সাল আমাদের অজ্ঞাতই থেকে গেছে, তবু প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি কোন কালপর্ব থেকে এই সকল ছড়ার উদ্ভব।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যত বেড়েছে, সেই আন্দোলনের সাথে সাথে রাজনৈতিক ছড়ার ব্যবহারও ততই বেড়েছে। মূলত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলা রাজনৈতিক ছড়ার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল ও তার পরে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও সাম্যবাদী আন্দোলনেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচনেও আধুনিক আঙ্গিকে এই সকল রাজনৈতিক ছড়া ব্যবহৃত হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। বর্তমানে এই সকল রাজনৈতিক ছড়াগুলি রচিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি আদর্শকে তুলে ধরার জন্য এবং শাসকদলের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ছড়ার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসক কিংবা বিরোধী উভয় দলই পক্ষে বিপক্ষে এই ধরনের ছড়ায় দেওয়াল ভরিয়ে তোলেন এবং দেওয়াল দখলের যুদ্ধে মেতে ওঠেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলির প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ছড়ার ভূমিকা। এই আলোচনা থেকে আমরা পেলাম, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ সংসদীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রাক্‌লগ্নে এত বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের রমরমা ছিল না, তখন নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম মাধ্যম ছিল রাজনৈতিক ছড়া। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম অর্থাৎ টিভি, রেডিও, মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার সহজলভ্য হলেও নির্বাচনী প্রচারে বাংলা রাজনৈতিক ছড়া তার ঐতিহ্য হারায়নি বরং আগের তুলনায় আরও বেশি দেওয়াল লিখন লক্ষ্য করা যায়। কারণ জনমানসের কথা মনে রেখে নিতান্ত পরিচিত বক্তব্যকেই এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই সহজেই রাজনৈতিক ছড়া জনপ্রিয়তা লাভ করে। মানুষ এইসব ছড়া পাঠ করে বা শুনে বিচিত্র আনন্দ পায়। তীক্ষ্ণ শ্লেষ, ব্যঙ্গে এগুলি হয় মর্মভেদী। তাই প্রচার মাধ্যম হিসাবে রাজনৈতিক ছড়ার জুড়ি মেলা ভার।

গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রাজনৈতিক ছড়ার ছড়াকার বা স্রষ্টার পরিচয়। এই সকল ছড়ার স্রষ্টার পরিচয় খুঁজতে গিয়ে যা পেলাম তা হল- সচরাচর রাজনৈতিক ছড়ার ব্যবহার দেওয়াল লিখনে লক্ষ্য করা গেলেও প্রতিষ্ঠিত কবির দ্বারাও প্রচুর রাজনৈতিক ছড়া মুদ্রিত হতে দেখা যায়। আমরা এই সকল রাজনৈতিক ছড়াগুলিকে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া হিসেবে চিহ্নিত করেছি। অপরদিকে নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত দেওয়াল লিখনের ছড়াগুলিকে অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া হিসেবে চিহ্নিত করেছি। কারণ দেওয়াল লিখনে যে সকল রাজনৈতিক ছড়া লক্ষ্য করা যায়, তার কোনটাতেই স্রষ্টার উল্লেখ থাকে না। কেবলমাত্র দলীয় প্রতীক চিহ্ন, প্রার্থীর নাম, দলের নাম ইত্যাদি থাকে। যার ফলে এই সকল ছড়াগুলি কোন ব্যক্তি নামে প্রচারিত না হয়ে কেবলমাত্র দলের নামে প্রচার লাভ করে, যে কারণে এই সকল ছড়াগুলিকে অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া হিসাবে চিহ্নিত করা হল।

লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় আঙ্গিক হল ছড়া। যেখানে ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টিই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আর সমষ্টিগত মানুষের সেই ছন্দিত ফসল আজ আকর্ষণ করে আধুনিক কবি-মানসকে। সাম্প্রতিককালের কবিরাও অনেক সময় ছড়ার মত জনপ্রিয় আঙ্গিককে ব্যবহার করে মানুষের আরো কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন। আর যে কারণে ছড়া রচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এবং পরবর্তীকালে তাঁর দেখানো পথে প্রায় সকল বড় কবিই অনায়াসে পদচারণা করেছেন। ফলস্বরূপ গ্রামীণ ছড়ার মধ্যে এসেছে নাগরিক বৈদগ্ধ্য এবং লোকায়ত শিল্পে লেগেছে ব্যক্তিগত রং। এই ধারাতেই অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অমিতাভ চৌধুরি প্রমুখ কবিগণ বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন এটাই স্বাভাবিক।

আলোচিত এই অভিমুখগুলির মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করলাম কয়েকটি সিদ্ধান্ত। প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারগণ ছড়ার মত সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যমকে হাতিয়ার করে যেতে চেয়েছেন জনমানসের কাছাকাছি। তাছাড়া ছড়ার ছন্দে ও চালে আছে লোক সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার নিজস্ব ও ব্যাপক ক্ষমতা। ছড়ার এই শক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন আধুনিক কালের প্রায় সকল ছড়াকার। তবে ছড়া চর্চার পিছনে নিহিত আছে তাঁদের ঐতিহ্যবোধও। প্রাচীনকাল থেকে ছড়ার মধ্যে যে স্বপ্ন ও সংগ্রাম, আশা ও প্রতিবাদ এবং জীবনময়তার ওম জড়িয়ে আছে, ঐতিহ্যবোধে তার নব রূপায়ন ঘটাতে চেয়েছেন উক্ত ছড়াকারগণ।

গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়া রচনার প্রেক্ষিত। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন থেকে ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের যতগুলি নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে, প্রত্যকটি নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি কিভাবে দেওয়ালে ফুটে উঠেছে বা ছড়ার আঙ্গিকে ধরা দিয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। নির্বাচন মানেই কী তত্ত্বের কচকচানি, বিরোধীদের কড়া সমালোচনায় কোণঠাসা করার চেষ্টা নাকি প্রতিশ্রুতির বন্যা? নিন্দুকেরা এসব বললেও নির্বাচনের সঙ্গে জুড়েছে কবিতা, ছড়া, কার্টুন চিত্র ও সৃষ্টিশীলতার নানা দিক। সেটা দেওয়ালের রং দিয়ে প্রার্থীর

প্রচার হোক বা মিছিলের নতুন ধরনের সে স্লোগান। এই দেওয়ালের প্রচার যুদ্ধ তো আর ঘোড়ায় চড়ে হয় না। তাই ছড়ায় চড়ে হাজির হন প্রার্থীরা। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ব্যঙ্গ করে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরতে অস্ত্র হয় ছড়া।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় প্রত্যেক ভোটের আগে এই ধরনের দেওয়াল লিখন চোখে পড়ে। শহুরে কিংবা গ্রামের মানুষ উদাসীন কিংবা সিরিয়াস ভোটার, সকলের কাছে পৌঁছতে ছড়ার চেয়ে নিশ্চিত অথচ সহজ পথ আর নেই। ছন্দের কারণেই তা মনে থেকে যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাজ্যে ভোট শুরু হলে চায়ের দোকান উত্তপ্ত হবে, দেওয়াল জুড়ে চুনকামের পোঁচ পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তাতে লাল, সবুজ, গেরুয়া নানা রঙের লড়াই। নানা ফুল, হাতুড়ি, কাস্তে, হাতের সমাহার। অবাক হলে চলবে কেন! রাজ্যে ভোট শুরু হয়েছে অথচ দেওয়াল শান্ত থাকবে তা কি করে হয়? ভোটের আঁচে তাও বর্ণময়, বিশেষ করে ছড়াময়। হাল সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার কিংবা চ্যানেলে প্রচার এসব এসেছে বটে কিন্তু সে আর কদিনের? এখনও ভোট প্রচারের ট্র্যাডিশনাল মাধ্যম তো দেওয়ালই।

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে। সেটি হল মূলত সত্তরের দশক থেকে বাংলা রাজনৈতিক ছড়ার ভাষা একটু একটু করে শালীনতার সীমা অতিক্রম করতে থাকে। নির্বাচনী চাপান-উতোর দলকে অতিক্রম করে ব্যক্তি আক্রমণে পর্যবসিত হয়। আর এই ভাষা দৌরাত্ম্যের খেলায় মেতে উঠেছেন বর্তমান রাজনীতিকরা। যুযুধান দল একে অপরকে বিদ্ধ করবে, রাজনীতির কারবারিরা পরস্পরের দিকে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করবেন- তা তো বটেই। তবে বিদ্ধ করার অস্ত্র হবে যুক্তি এটাই প্রত্যাশিত। প্রথা, শিষ্টাচার এটাই দাবি করে। কিন্তু নির্বাচনের মরশুম এলে নেতাদের মুখের আগল খসে পড়ে। শালিনতাবোধের তোয়াক্কা না করে চলে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও ব্যক্তিগত আক্রমণের পালা। যা কোন ভাবেই কাম্য নয়।

পঞ্চম অধ্যায়টিতে দেশভাগের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও পাকিস্তানি শাসনে তৎকালীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যে দুর্দশার চিত্র ছড়ার মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে তা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পেলাম সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ছড়াগুলি অর্থবোধে কালোপযোগী বিবর্তিত হয়। আর এই বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ছড়ায় ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস ধরা পড়েছে। তবে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সব থেকে বেশি রাজনৈতিক ছড়া তৈরি হয়েছে। তার কারণ যুদ্ধের সময় মুক্তি যোদ্ধাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য এবং অত্যাচারী পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে এই ধরনের ছড়া রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

রাজনীতি মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য। রাজনীতির এই মূলমন্ত্র খুব কম সংখ্যক লোকই এই পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন। খুব কম সংখ্যক লোকই রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন গড়েছেন। তেমনি একজন বিরল রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, দল ও সেই দলের নীতি

আদর্শ জনগণের মনোজগতে প্রভাব ফেলে। তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ কিংবা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ছড়ায়। এছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক ছড়ায় দুর্নীতি কিংবা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তবে বেশিরভাগ রাজনৈতিক ছড়া রচিত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক ও প্রার্থীর গুণগান করে।

আমাদের গবেষণার শেষ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সাহিত্যগুণের নিরিখে রাজনৈতিক ছড়া। এই অধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যে অভিমুখগুলি উঠে এসেছে তা হল- প্রথমত সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যতত্ত্বের এই চুল-চেরা বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে ছড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে কাব্য-সাহিত্যের মাপকাঠিতে নিশ্চয় একথা বলা যায় যে, শব্দ মাধুর্য, ছন্দ প্রয়োগ, অলংকার সুষমা, ধ্বনিঝংকার সব মিলিয়ে এক আস্বাদ্যময় শ্রুতিসুখকর রচনা হল ছড়া। স্বাভাবিকতা ও প্রাঞ্জলতা যদি কবিতার বৈশিষ্ট্য হয়, আধুনিক যুগের কাব্যরসিক পাঠক যদি তাতে কবিত্বের স্পর্শ পায়, তবে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ছড়ার মধ্যে কবিত্বের সন্ধান করা যায়। দ্বিতীয়ত এই ছড়ার ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দ বাঙালির, বাংলার একেবারে নিজস্ব ছন্দ, সংস্কৃত, প্রাকৃত কিংবা অপভ্রংশের স্পর্শরহিত নানান লৌকিক উৎস এর প্রাণ। এই ছন্দই পরম্পরায় বাহিত হয়ে শক্তিশালী করেছে পরবর্তীকালের কবিতার ছন্দের একটি ধারাকে। তাই আধুনিক পর্বে রচিত যে সৃজিত দলবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলি দেখি তার পূর্ব উৎস লৌকিক ছন্দই। অনুরূপভাবে বাংলা রাজনৈতিক ছড়াগুলি লোক আঙ্গিকের ছন্দ গ্রহণ করলেও শব্দচয়ন আধুনিক। নিম্নে রাজনৈতিক ছড়ার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

চিনের চিহ্ন/ কাস্তে হাতুড়ি ৪+৪

পাকিস্তানের তারা ৪+২

এখনো কি/ বলতে হবে ৪+৪

দেশের শত্রু/ কারা? ৪+২

(১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের অভিঘাত পড়েছিল ১৯৬৭ সালের নির্বাচনী ছড়ায়। উক্ত ছড়াটি তৎকালীন কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন।)

তৃতীয়ত কাব্যসাহিত্যের ব্যঞ্জনা হল সুদূরপ্রসারী। কিন্তু জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হল বাংলা রাজনৈতিক ছড়া। নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত এই সকল ছড়ায় মূলত তাৎক্ষণিকতাকে তুলে ধরা হয়। তাই এই ধরনের ছড়াগুলিতে পাশ্চাত্য Imagery-র স্বরূপের সঙ্গে সবটা মেলানো যায় না। তবে এদের চিত্রকল্পনায় যে সৌন্দর্য আছে তা সাধারণভাবে Imagery বা চিত্রকল্পই রচনা করেছে। তবে রাজনৈতিক ছড়ার নন্দনতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে।

সামগ্রিকভাবে ভারতে এবং তার অংশ হিসেবে বঙ্গে আধুনিক যুগের রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব গ্রহণ গণতান্ত্রিক চেতনারই অংশ। লক্ষণীয় যে, আধুনিক ছড়ার রচয়িতাগণ

সকলেই মধ্যবিত্ত এবং ভারতীয় জাতিয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসের গভীর, বিস্তৃত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপকরণ আধুনিক রাজনৈতিক ছড়ায় লাভ করেছে বিস্তৃত আয়তন। আমাদের গবেষণার সামগ্রিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এই অভিমুখগুলিকেই চিহ্নিত করলাম। যদি আমাদের এই সিদ্ধান্তসমূহ ভবিষ্যতের গবেষকদেরকে উৎসাহিত করে তাহলে আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থ(বাংলা):

১. অভিজিৎ রায়, *প্রফুল্ল সেন- অতুল্য ঘোষ ও সমকালীন রাজনীতি,* সাগর বুকস, কলকাতা, ১৪২০।

২. অমল কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর(১৯৪৭-১৯৯৭),* এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৯৯।

৩. অমলেন্দু দে, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক,* রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২।

৪. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *জোয়ার ভাটায় ষাট-সত্তর,* পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫. অরুণ ঘোষ(সম্পাদিত), *জনযুদ্ধ, দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দলিল সংগ্রহ-৪ (১৯৪৬-১৯৪৭),* সেরিবান, কলকাতা, ২০০১।

৬. অনাদিকুমার মহাপাত্র, *ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি,* সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২।

৭. অন্নদাশঙ্কর রায়, *ছড়াসমগ্র,* বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩।

৮. অন্নদাশঙ্কর রায়, *মুক্তবঙ্গের স্মৃতি,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪০৫।

৯. অন্নদাশঙ্কর রায়, *কাঁদো প্রিয় দেশ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮।

১০. অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

১১. আবীর কর, *ভোটের রঙ্গ-রসিকতা,* বর্ণপরিচয়, পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২।

১২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য(১৭৫৭-১৯১৮),* প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০১।

১৩. আলম তালুকদার, *বঙ্গবন্ধুর ছড়া,* অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩।

১৪. আব্দুল মোমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২।

১৫. আবুল হাসিম, *আমার জিবন ও বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮।

১৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৩।

১৭. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য,* প্রথম খণ্ড, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২।

১৮. ইসরাইল শেখ, *কত ছড়া কত রঙ(প্রবন্ধ),* কালের আলোয় দাঁড়িয়ে(নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন), দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৮।

১৯. ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলা লোকসাহিত্যে ছড়া,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮।

২০. কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা,* খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৪।

২১. কামরুদ্দিন আহমেদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২।

২২. গোলাম আহমদ মোর্তাজা, *রক্তমাখা ছন্দ,* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩।

২৩. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী(১৯১৫-১৯৩০),* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৪।

২৪. জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কবি,* ভারবি, কলকাতা, জুলাই-২০১৪(পুনর্মুদ্রণ)।

২৫. জহর সেন মজুমদার, *কবিতার দ্বীপ কবিতার দীপ্তি,* সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ২০১৮।

২৬. জয়গোপাল মণ্ডল, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ঘর ও বাহির,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ২০০৭।

২৭. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ,* প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২৮. দেবশ্রী পালিত, *ছড়া লোকায়ত জীবনের কারুভাষ,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২।

২৯. দেবাশীষ বসু, *বাংলা ছড়ায় সমাজ-ভাবনা,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৪।

৩০. নলিনীকান্ত সরকার, *দাদাঠাকুর,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৩৮০।

৩১. নির্মলেন্দু ভৌমিক, *বাংলা ছড়ার ভূমিকা,* সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৭৯।

৩২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০০।

৩৩. নবারুণ ভট্টাচার্য, *পুরন্দর ভাটের কবিতা,* ভাষাবন্ধ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২।

৩৪ নবারুণ ভট্টাচার্য, *কাঙাল মালসাট,* সপ্তর্ষি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

৩৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০১৬।

৩৬. পরিমল গোস্বামী, *আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১০।

৩৭. প্রণব বিশ্বাস(সম্পাদিত), *ছড়াসংগ্রহ,* সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১।

৩৮. পবিত্র অধিকারী, *তিনশো বছরের বাংলা প্যারোডি,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

৩৯. পল্লব সেনগুপ্ত, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১২।

৪০ পূর্ণেন্দু পত্রী, *কালি কলম মন (প্রবন্ধ সংকলন),* ঊর্বী প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২।

৪১. ফজলুল হক সরকার, *ছড়া সঞ্চয়ন,* নান্দনিক, ঢাকা, ২০১৩।

৪২. বরুণ সেনগুপ্ত, *রচনা সংগ্রহ,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০১৯।

৪৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *বাংলা ছড়া পরিক্রমা,* অক্ষয় প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪।

৪৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৬।

৪৫. বদরুদ্দীন উমর, *বঙ্গ-ভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি,* চিরায়ত প্রকাশন প্রা: লি:, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪।

৪৬. বদরুদ্দীন উমর, *কার দিন বদল হোল,* আফসার ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১০।

৪৭. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *নির্বাচিত কবিতা,* সম্পাদনা- পুলক চন্দ, কথাশিল্প, কলকাতা, জুলাই, ১৯৮০।

৪৮. বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ,* মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫।

৪৯. বারিদ বরণ ঘোষ, *স্মরণীয় বিংশ শতক (১৯০১-১৯৯৯),* মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ২০০০।

৫০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সংকলিত ও সম্পাদিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* প্রথম খণ্ড(১৮১৮-১৮৩০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৪৪।

৫১. বিপিন চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জী আদিত্য মুখার্জী, অনুবাদ: আশিষ লাহিড়ী, *ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে(১৯৪৭-২০০০)*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০৬।

৫২. *বীরেন্দ্র সমগ্র,* প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা-সব্যসাচীদেব, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১।

৫৩. বিশ্ব বিশ্বাস, *বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান,* বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৭১।

৫৪. বিশ্ব গঙ্গোপাধ্যায়, *কার্টুন রং-বিচিত্রা,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২০।

৫৫. ভবতারণ দত্ত (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলা ছড়া,* পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমী, কলকাতা, ২০০৯।

৫৬. ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, *ছড়াসমগ্র,* সূর্য পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৭।

৫৭. *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫৮. মইনুল হোসেন চৌধুরী, *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য (স্বাধীনতার প্রথম দশক),* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০।

৫৯. মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৭।

৬০. মন্টু মিত্র, *আধুনিক কবিতার পাঁচ কলম,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৯।

৬১. মোহাম্মদ হাননান, *হাজার বছরের বাংলাদেশ ইতিহাসের অ্যালবাম,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫।

৬২. *মুক্তির সংগ্রামে ভারত,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩১৪।

৬৪. রবীন্দ্রনাথ শাসমল, *বাংলা লোকসাহিত্যের ঐতিহাসিক উপাদান,* ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২২।

৬৫. রামচন্দ্র গুহ, *গাঁধী-উত্তর ভারতবর্ষ,* অনুবাদ: আশীষ লাহিড়ী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০১২।

৬৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ),* মুক্তি সংগ্রাম, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০।

৬৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ),* জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১।

৬৮. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৬,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৯৯।

৬৯. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৭,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০০।

৭০. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *জিন্না: পাকিস্তান (নতুন ভাবনা),* মিত্র ও ঘোষ প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০৯।

৭১. শুভেন্দু দাশগুপ্ত, *বাংলা কার্টুনে ভোট গ্রন্থনা,* মনফকিরা, কলকাতা, ২০১৪।

৭২. *সাত দশক: সমকাল ও আনন্দবাজার,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৯৯।

৭৩. সালাহউদ্দিন আহমেদ, *ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭।

৭৪. সুমন চট্টোপাধ্যায়, *রাজ্যপাট,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮।

৭৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১-৫ খণ্ড),* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।

৭৬. সুকুমার বড়ুয়া, *ছড়াসমগ্র,* সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩।

৭৭. সুস্মিতা সোম, *বাংলা ছড়ায় বাঙলা দেশের ইতিহাস,* সোপান, কলকাতা, ২০১৫।

৭৮. সুশান্ত ঘোষ, *বাংলার রাজনীতি প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬।

৭৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *পদাতিক কবি, রক্তিম কবিতা,* বিজয় সিংহ, তেহাই, কলকাতা।

৮০. *সুভাষ মুখোপাধ্যায়: কথা ও কবিতা,* সম্পাদনা- শঙ্খ ঘোষ, সৌরীণ ভট্টাচার্য, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮।

৮১. সুমিতা চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়,* প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯২।

৮২. সুমিত ঘোষ, *ভারতের রাজনৈতিক কার্টুন চর্চা,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০১৫।

৮৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *১৮৫৭ এবং তাঁর পর,* অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮।

৮৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *গণতন্ত্রের পক্ষ-বিপক্ষ,* বিদ্যাপ্রকাশ, ঢকা, ১৯৯৩।

৮৫. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস(১৮৫৮-১৯৬৪)*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৮৬. সৌগত চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদনা), *বাংলা ছড়া ছড়ার বাংলা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮।

৮৭. সৌমেন সেন, *লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য,* পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৪।

৮৮. সৌমেন সেন, *লোকসংস্কৃতির প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন,* অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮।

৮৯. স্বপন বসু, *গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০।

৯০. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, *আলাপ-বিলাপ,* কোরক, কলকাতা, ২০১২।

৯১. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলাদেশ: সংস্কৃতি ও সাহিত্য,* গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৪০৮।

৯২. শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, *'ভোটমঙ্গল, সজীব পুতলোনাচ*, এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান প্রন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ১২৮৯।

সহায়ক গ্রন্থ(ইংরেজি):

1. C. R. Irani, *Bengali: The Communist challenge*, Bombay, 1968.
2. Dr. Nazimuddin Ahmed, *Discover the Monuments of Bangladesh*, UPL, Dhaka, 1984.
3. Jyoti Basu, *Subversion of Parliamentary Democracy in West Bengal*, Calcutta, 1972.
4. Michel Edwards, *British India(1772-1947*), Rupa and co., Calcutta, 1993.
5. Partha Chatterjee, *The present History of West Bengal: Essays in political criticism,* Calcutta, 1998.
6. Prafulla Roy chaudhuri, *Left Experiment in West Bengal,* New Delhi, 1985.

7. Rakhahari Chatterjee, *politics in West Bengal: Institutions*, Process and Problems, Calcutta, 1985.
8. Sajal Basu, *Politics of Violence: a case study of west Bengal*, Calcutta, 1982.
9. Shamsuzzaman Khan(Editor), *Folklore, New Challenger*, The Proceedings of the International folklore Conference Dhaka, Bangla Academi, Dhaka, 2013.
10. Soumen Sen, *Folklore Tradition Urbanity,* Anjali Publishers, Kolkata, 2013.
11. Sukumar Biswas, *Communal Riots in Bangladesh and West Bengal(1947-1964),* Parul, Kolkata, 2012.

পত্রপত্রিকা

১. *দেশ, বিপ্লবের শতবর্ষ সংখ্যা,* সম্পাদক- সুমন সেনগুপ্ত, ২ নভেম্বর ২০১৭, কলকাতা।
২. *দেশ, প্রিয়দর্শিনী- ১০০(ইন্দিরা গান্ধি)বিশেষ সংখ্যা,* সম্পাদক-সুমন সেনগুপ্ত, ১৭ নভেম্বর, ২০১৭, কলকাতা।
৩. *দিবারাত্রির কাব্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা,* সম্পাদক- আফিফ ফুয়াদ, ২০০৫, কলকাতা।
৪. *সাপ্তাহিক বর্তমান, আমলাগাছি সংখ্যা,* ১৬ আগস্ট ও ৩০ আগস্ট ২০১৪, কলকাতা।
৫. *বিষয় কার্টুন, বিনয় কুমার বসু স্মরণ সংখ্যা,* সম্পাদক- বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়, নবম বর্ষ, চৈত্র ১৪২২, কলকাতা।
৬. *শারদ সুকান্ত, 'বিষয়: পরিবর্তন' বিশেষ সংখ্যা,* ১৪/২ ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া, ২০০৯।
৭. *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য,* খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৮৭- ১৮৮।
৮. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, ছড়া: বিষয় ও রাজনীতি সংখ্যা,* সম্পাদক- সনৎকুমার মিত্র, ১৪০০, কলকাতা।

সংবাদপত্র

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, *কংগ্রেস সংখ্যা,* ১৩৩৪, কলকাতা।

২. আনন্দবাজার পত্রিকা, *কংগ্রেস সংখ্যা,* মাঘ ১৩৩৫, কলকাতা।

৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, *কংগ্রেস সংখ্যা,* পৌষ ১৩৩৬, কলকাতা।

৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, *কংগ্রেস সংখ্যা,* কার্ত্তিক ১৩৪১, কলকাতা।

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, *কংগ্রেস সংখ্যা,* ১৩৫৫, কলকাতা।

৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, *রবিবাসরীয়, ভোটের ছড়া শীর্ষক আলোচনা,* ২ এপ্রিল, ২০১৪, কলকাতা।

৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, *ফিরে দেখা কুট্টির কার্টুন শীর্ষক বিশেষ আলোচনা,* ১ ডিসেম্বর, ২০১৫, কলকাতা।

৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, *গেল ভোট রইল দেওয়াল,* ২৩ এপ্রিল, ২০১৬, কলকাতা।

৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, *জনগণমনতন্ত্র বিশেষ ক্রোড়পত্র,* ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮, কলকাতা।

১০. আনন্দবাজার পত্রিকা, *আনন্দদর্পণ, আমরা ও মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা,* ১৩ মার্চ, ২০১৮, কলকাতা।

১১. আনন্দবাজার পত্রিকা, *রবিবাসরীয়, গান্ধি ১৫০ বিশেষ ক্রোড়পত্র,* ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, কলকাতা।

১২. আনন্দবাজার পত্রিকা, *রবিবাসরীয়, তোমার ক্যাডার তুমি নাচাও শীর্ষক আলোচনা,* ১৯ মে, ২০১৯, কলকাতা।

১৩. এই সময়, কার্টুন, *ছড়ায় কোন্নগরের দেওয়াল ভরাচ্ছে তৃণমূল শীর্ষক প্রতিবেদন,* ৯ মার্চ, ২০১৬, কলকাতা।

১৪. বর্তমান, *কেমন ছিল অতীত দিনের নির্বাচনী প্রচার,* ৪ মে, ২০১৪ কলকাতা।

১৫. গণশক্তি, *নির্বাচনী ছড়া,* ৩০ মার্চ, ২০১৪, কলকাতা।

১৬. দৈনিক বসুমতী, *ভোটতামাশা,* ২ জানুয়ারি, ১৯৬৯, কলকাতা।

সহায়ক অভিধান গ্রন্থ

১. *আকাদেমি বানান অভিধান,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১।

২. *সংসদ বাংলা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯।

৩. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২।

৪. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস(সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলা ভাষার অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৯।

৫. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি(সংকলিত), *বাঙ্গালা শব্দকোষ,* ভূর্জপত্র, কলকাতা, ১৩৯৭।

৬. রাজশেখর বসু, *চলন্তিকা(আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান),* এম সি সরকার অ্যাণ্ড প্রা: লি: কলকাতা, ১৪০৫।

৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, ১৯৭৮।